

# আধুনিক জাহেলিয়াত

(মুসলিম সমাজে চলমান জাহেলিয়াত ও প্রচলিত ভুলভ্রান্তির সংশোধনী)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

# সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় <b>জাহেলিয়াত পরিচিতি</b>	<b>১৫</b>
পবিত্র কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াত শব্দের প্রয়োগ	১৬
বর্তমান অবস্থা কি জাহেলিয়াত	১৯
জাহেলিয়াত থেকে বাঁচার দুআ	২১
জাহেল কে	২২
জাহেলের প্রকারভেদ	২২
জাহেলিয়াত বৃদ্ধির কারণ	২২
জাহেলিয়াত অনুসরণের পরিণাম	২৮
জাহেলিয়াতের ধারক-বাহক	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায় <b>ধর্মীয় জাহেলিয়াত</b>	<b>৩৯</b>
শিরক	৪০
শিরক করার কারণসূমহ	৪৬
শিরকের শাস্তি	৫২
শিরক থেকে বাঁচার দুআ	৫২
ছোটো শিরক ও লোকদেখানো আমল থেকে বাঁচার দুআ	৫৪
বিদআত	৫৪
বিদআতের মাধ্যমে সাধিত বিষয়	৫৭
বিদআতের পরিণতি	৬২
জেনে-বুঝে হক গোপন	৬৪
দুনিয়াবি স্বার্থে দ্বীনি ইলম অর্জন	৬৪
কুসংস্কারে বিশ্বাস	৬৬

দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত কতিপয় শ্রান্ত কাজ ও ধারণা	৬৯
পূর্বপুরুষদের অঙ্কভাবে অনুসরণ	৭৩
দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি	৭৪
দ্বীনকে দলে দলে বিভক্ত করা	৭৫
রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি	৭৭
কোয়ান্টাম মেথড : জাহেলিয়াতের নব্য সংস্করণ	৭৮
কোয়ান্টাম মেথড কেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক	৭৯
তৃতীয় অধ্যায়	
<b>সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত জাহেলিয়াত</b>	<b>৮৩</b>
সভ্যতা-সংস্কৃতি কী	৮৩
আধুনিকতার নামে জাহেলিয়াত	৮৪
প্রযুক্তির ব্যবহারে জাহেলিয়াত	৮৫
প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহারের উপায় ও মাধ্যম	৯০
মিডিয়ার জাহেলিয়াত প্রতিরোধে আলিম সমাজের দায়িত্ব	৯১
অপসংস্কৃতির অনুসরণ	৯২
বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ	৯৩
কৃত্রিম সৌন্দর্য জাহির করা	৯৫
দাড়ি না রাখা	৯৭
টাখনুর নিচে কাপড় পরা	১০০
শখের বশে কুকুর পোষা	১০১
কবরে পুষ্পাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুষ্পমাল্য অর্পণ	১০২
ছবিকে সম্মান জানানো	১০৪
মূর্তি, ভাস্কর্য তৈরি করা	১০৭
পাপাচারী ব্যক্তির অনুসরণ	১০৮
নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তিদান	১০৮
অপচয়-অপব্যয়	১০৯
সালাম ও মুসাফাহকেন্দ্রিক ভুলভ্রান্তি	১১১
অগ্নি হত্যা	১১৬

পিতা-মাতার অবাধ্যতা	১১৭
সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে তৈরি করার উপায়	১২০
আখিরাতের চেয়ে পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার	১২০
আত্মসাৎ	১২১
মাদকদ্রব্য	১২৩
জুয়া ও লটারি	১২৭
জুয়া খেলার শাস্তি	১২৯
অশ্লীল গান-বাজনা	১৩০
যিনা-ব্যভিচার ও হারাম সম্পর্ক	১৩৩
যিনার শাস্তি	১৩৫
যিনাকারীকে বিয়ে করা মুমিনের জন্য হারাম	১৩৭
যিনা থেকে দূরে থাকার পুরস্কার	১৩৮
যিনা থেকে বাঁচার উপায়	১৩৮
<b>চতুর্থ অধ্যায়</b> <b>অর্থনৈতিক জাহেলিয়াত</b>	<b>১৪০</b>
সুদব্যবস্থা	১৪০
পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা	১৪৪
জাকাতসংক্রান্ত জাহেলিয়াত	১৪৮
শ্রমের মূল্য আদায় না করা	১৫১
ঋণখেলাপি	১৫২
জবরদখল, জমি দখল	১৫৮
জনগণের অর্থ আত্মসাৎ	১৫৯
ঘুস আদান-প্রদান	১৬০
<b>পঞ্চম অধ্যায়</b> <b>আল কুরআনকে নিয়ে জাহেলিয়াত</b>	<b>১৬২</b>
কুরআনের বিভিন্ন সূরার মনগড়া ফজিলত	১৬২
কুরআন দিয়ে নানাবিধ অন্যায় কর্ম	১৬৪
কুরআনকে ঘিরে কতিপয় ভুল ধারণা	১৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায় <b>নবি-রাসূলগণের জীবনী নিয়ে দ্রষ্টব্য</b>	<b>১৭৪</b>
আদম (আ.)-এর গন্ধম খাওয়া	১৭৫
আদম ও হাওয়া (আ.) এবং বিয়ের মহরানা	১৭৬
ময়ূর ও সাপের সাহায্য গ্রহণ	১৭৬
পৃথিবীতে অবতরণ	১৭৬
নুহ (আ.)-এর নৌকায় মলত্যাগ ও পরিষ্কারের ঘটনা	১৭৭
ইদরিস (আ.)-এর জান্নাতে যাওয়ার ঘটনা	১৭৭
শাদাদের বেহেশত তৈরি বনাম জিবরাইল (আ.)-এর কান্না	১৭৮
আইয়ুব (আ.)-এর বালা-মুসিবত	১৭৮
দাউদ (আ.)-এর নামে কথিত কাহিনি	১৭৮
ইউসুফ (আ.) ও জুলেখার প্রেমকাহিনি	১৭৯
ইবরাহিম (আ.)-এর মেহমানদারি	১৮১
ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির ঘটনায় বাড়াবাড়ি	১৮১
সোলায়মান (আ.)-এর দাওয়াত	১৮২
জাকারিয়া (আ.)-এর নামে ছড়ানো মিথ্যা কাহিনি	১৮৩
রাসূল ﷺ সম্পর্কে প্রচলিত বানোয়াট কাহিনি	১৮৩
সাহাবি, তাবয়ি ও নেককার লোকদের নামে চালানো মিথ্যাচার	১৮৯
সপ্তম অধ্যায় <b>আকিদা-বিশ্বাসে ভুলভ্রান্তি</b>	<b>১৯২</b>
ঈমান বিধ্বংসী ১০টি কারণ	১৯২
আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে মূলনীতি	১৯৪
আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদা	১৯৫
অষ্টম অধ্যায় <b>ইবাদতকেন্দ্রিক ভুলভ্রান্তি</b>	<b>২০৪</b>
কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার মূলনীতি	২০৫
তাহারাতসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি	২০৭

মিসওয়াক, টুপি, পাগড়িবিষয়ক ভুলভ্রান্তি	২০৮
আজান ও ইকামতবিষয়ক ভুলভ্রান্তি	২০৮
মসজিদ-মাদরাসা প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি	২০৮
সালাতবিষয়ক ভুলভ্রান্তি	২১০
দুআয় প্রচলিত বিভ্রান্তি	২১১
জিকির নিয়ে প্রচলিত বিভ্রান্তি	২১৪
দরগদেহের নামে জাহেলিয়াত	২১৬
নবম অধ্যায়	
<b>বিভিন্ন চাঁদের ফজিলতের নামে জাহেলিয়াত</b>	<b>২১৮</b>
মুহররম মাস	২১৮
সফর মাস	২২১
রজব মাস	২২২
শাবান মাস	২২৩
রমজান মাস	২২৫
ঈদবিষয়ক কতিপয় ভুল	২২৭
দশম অধ্যায়	
<b>নামের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি</b>	<b>২২৯</b>
আল্লাহর নামে বিকৃতি	২৩৩
একাদশ অধ্যায়	
<b>বিশ্বাস ও মতবাদগত জাহেলিয়াত</b>	<b>২৩৫</b>
সুফিবাদ	২৩৫
হুলা বা অদ্বৈতবাদ	২৩৬
‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’ ধারণায় বিশ্বাস করা	২৩৭
শনির দশায় বিশ্বাস করা	২৩৯
দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে, এ কথা বিশ্বাস করা	২৩৯
ধর্মের বাপ, মা, ভাই, বোন ইত্যাদিতে বিশ্বাস	২৩৯

দ্বাদশ অধ্যায় পরিভাষাগত জাহেলিয়াত	২৪১
বান্দাকে গাউসুল আজম বলা	২৪১
করবকে মাজার বা দরগা বলা	২৪১
জান্নাতুল বাকী বলা	২৪১
মা ফাতিমা বলা	২৪২
মৃত্যুঞ্জয়ী বলা	২৪৩
মৃত্যুর ফেরেশতাকে আজরাইল বলা	২৪৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় কবিতা, গজলে ভ্রান্ত বার্তা	২৪৫
শেষ কথা	২৫১
গ্রন্থপঞ্জি	২৫২

## প্রথম অধ্যায় জাহেলিয়াত পরিচিতি

الجاهلية (আল জাহেলিয়াত) শব্দটি এসেছে الجهلة থেকে।-এর সাথে তাশদিদযুক্ত ‘ইয়া’ যুক্ত করে জাহেলিয়াত গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ— অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ, To act stupidly, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা (Ignorance), অজ্ঞানতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা, সঠিক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। এর আরেক অর্থ—প্রাক ইসলামি যুগে আরবদের অবস্থা।<sup>১</sup> কেননা, প্রাক ইসলামি যুগে আরব মুশরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে ওহির কোনো সম্পর্ক ছিল না। মানুষ সার্বিকভাবে ছিল প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর জাহেলিয়াত বলতে মূলত আল্লাহ, নবি-রাসূল ও শরিয়াহ সম্পর্কে অজ্ঞতাকেই বোঝায়।<sup>২</sup>

মুফতি আমিমুল ইহসান কাওয়াইদুল ফিকহ গ্রন্থে জাহেলিয়াতের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন—

هي مدة الفقرة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين بعثه النبي (صلى) وقيل ما قبل فتح مكة -

‘ঈসা (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত মাঝখানের সময়কালকে জাহেলিয়াত বলা হয়। কেউ কেউ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে বুঝিয়ে থাকেন।’<sup>৩</sup>

পবিত্র কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াত শব্দের প্রয়োগ

পবিত্র কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াত শব্দটি মোট চারবার উল্লেখিত হয়েছে। যথা : সূরা আলে ইমরান : ১৫৪, সূরা মায়েদা : ৫০, সূরা আহজাব : ৩৩ এবং সূরা ফাতাহের ২৬ নম্বর আয়াতে।

১. সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ-

‘আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা মূর্খদের মতো।’

অর্থাৎ, আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাই জাহেলিয়াত। আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব—কথাটিকে অন্যভাবে বলা হলে তা হবে—‘তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করে।’

আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দুভাবে হতে পারে।

<sup>১</sup> লিসানুন আরব

<sup>২</sup> আল কুরআনুল কারিম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-১০২

<sup>৩</sup> আল কুরআনুল কারিম, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-১০২



ইতিবাচক অর্থে। যেমন :

- কিছু লোক মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাঁর সাথে আবার অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—  
‘অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।’ সূরা ইউসুফ : ১০৬
- মক্কার মুশরিকরা কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করত। তারা ভাবত—এগুলো তাদের সহায় হবে, সাহায্য করবে।<sup>৪</sup>
- মুশরিকরা বিশ্বাস করত, পাথরের মূর্তিগুলোর ইবাদত করলে সেগুলো তাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র করে দেবে।<sup>৫</sup> এ মূর্তিগুলো তাদের হয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।<sup>৬</sup> অথচ এগুলো শাফায়াতের ক্ষমতা রাখে না।<sup>৭</sup>
- তারা বলত, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।<sup>৮</sup> এজন্যই তারা ফেরেশতাকে মনে করত আল্লাহর কন্যা।<sup>৯</sup> অথচ সন্তান গ্রহণ করা মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। তিনি এর থেকে পবিত্র ও মহিমাময়।
- ইহুদিরা উজায়ের (আ.)-কে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত।<sup>১০</sup> খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও মারইয়াম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী মনে করত।<sup>১১</sup>

এভাবেই তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলি ধারণা পোষণ করে থাকে।

নেতিবাচক অর্থে। যেমন :

আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস না করা—যাকে কুফর বলা হয়। সোজা কথায় নাস্তিকতা। কেননা, নাস্তিকরা বিশ্বাস করে—‘সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই।’

১. সূরা মায়েরদার ৫০ নম্বর আয়াতে ওহির বিধানকে অগ্রাহ্য করাকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তিরস্কার করে বলেছেন—

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ-

‘তারা কি জাহেলি যুগের বিধিবিধান তালাশ করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ ছাড়া উত্তম বিধান দানকারী আর কে আছে?’

<sup>৪</sup> সূরা মারইয়াম : ৮১

<sup>৫</sup> সূরা জুমার : ৩

<sup>৬</sup> সূরা ইউনুস : ১৮

<sup>৭</sup> সূরা জুখরুফ : ৮৬, সূরা রুম : ১৩

<sup>৮</sup> সূরা বাকারা : ১১৬, সূরা সাফফাত : ১৫১-১৫২, সূরা ইউনুস : ৬৮, সূরা বনি ইসরাইল : ৪০

<sup>৯</sup> সূরা জুখরুফ : ১৯

<sup>১০</sup> সূরা তাওবা : ৩০

<sup>১১</sup> সূরা তাওবা : ৩০

ওহির বিধানকে অগ্রাহ্য করে তার স্থানে অন্য বিধান তৈরির প্রবণতা একধরনের জাহেলিয়াত।

২. সূরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে বেপর্দাভাবে চলাফেরা করাকে আল্লাহ জাহেলিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

‘তোমরা ঘরের ভেতর অবস্থান করবে। জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবি পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।’

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়—ঘরের বাইরে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন, অশ্লীলতার প্রসার, সালাত আদায় না করা, জাকাত না দেওয়া, তাওহিদে বিশ্বাসী না হওয়া, রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, দীন থেকে গাফেল হওয়া ইত্যাদি জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সূরা ফাতহের ২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গর্ব, অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ করাকে জাহেলিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন—

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ فَأُنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا-

‘কাফিররা যখন তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাঁদের তাকওয়ার কালিমায় সুদৃঢ় করলেন। বস্তুত তাঁরাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।’

এই আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী পারস্পরিক বংশীয় অহমিকা ও অন্যকে হেয় করা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা জাহেলিয়াত হলো—

১. অন্ধকারাচ্ছন্নতা, বর্বরতা, হীনতা, নীচতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, সঠিক জ্ঞানের অভাব।
২. শিরক, বিদআত, অন্যায়, অবিচার, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডসমূহ।
৩. কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে আমলযোগ্য নয়; এমন সব কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি।

৪. আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, ওহির বিধানকে অগ্রাহ্য করে তার স্থানে অন্য কোনো বিধান ও নীতিমালা তৈরি করা, ঘরের বাইরে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো এবং দ্বীন থেকে গাফেল হওয়া।

৫. কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত আকিদা-বিশ্বাস ও সৎকর্মের বিরোধিতা করে এমন সব কর্মকাণ্ডও জাহেলিয়াত। কেননা, কোনো কিছু হকের বিরোধী হলে তা বাতিল বলেই গণ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

‘আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। সত্য প্রকাশের পর গোমরাহি ছাড়া আর কী থাকে? তাহলে তোমরা কোথায় ঘুরছ?’ সূরা ইউনুস : ৩২

### বর্তমান অবস্থা কি জাহেলিয়াত

জাহেলিয়াত কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা কালের নাম নয়; বরং মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার, নির্লজ্জতা, বর্বরতা; অশ্লীলতা, অশালীন নাচ-গান, ভোগবাদ, জুলুম-নিপীড়ন, মানবতার চরম অবক্ষয় ইত্যাদি যে যুগেই পাওয়া যাবে, যে সমাজেই ঘটবে, তা-ই জাহেলিয়াত বলে গণ্য হবে।

জাফর (রা.) নাজ্জাশির দরবারে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে জাহেলিয়াত শব্দ উল্লেখ করে তিনি এসব অন্যায়-অনাচারকেই বুঝিয়েছিলেন।<sup>১২</sup>

তাই সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের নানান দিক বিবেচনা করে দেখা যায়, আইয়ামে জাহেলিয়াতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নব্য সংস্করণে মানুষের চরিত্রে গভীরভাবে দানা বেঁধে আছে। এমন কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজ নেই, যা বর্তমানে হচ্ছে না; বরং এমন অনেক কাজই এখন হচ্ছে, যা প্রাক ইসলামিক জাহেলি যুগেও হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের রেখে গেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ওপর, যা রাত-দিনের মতোই সমুজ্জ্বল। তিনি বলেছেন—

‘আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি এক আলোকিত দ্বীনের ওপর, যা রাত-দিনের মতোই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমাদের ওপর আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে।’<sup>১৩</sup>

<sup>১২</sup> আল কুরআনুল কারিম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-১০২

<sup>১৩</sup> ইবনে মাজাহ : ৪৩

## তৃতীয় অধ্যায় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত জাহেলিয়াত

### সভ্যতা-সংস্কৃতি কী

সংস্কৃতি হলো—কোনো নির্দিষ্ট স্থানের মানুষের আচার-আচরণ, জীবিকার উপায়-উপকরণ, সংগীত, সাহিত্য, নতুন রীতিনীতি ইত্যাদি। সহজ কথায়— বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান, ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক আচার, সংগীত-শিল্পকলা—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আর সভ্যতা হলো—মানুষের সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট সময়ের গড় ফলাফল। অর্থাৎ, মানব সমাজের দীর্ঘ প্রয়াসে প্রাপ্ত সাফল্যের স্তরই হলো সভ্যতা। সহজ কথায়—মানুষকে যা সভ্য হতে শেখায়, তা-ই সভ্যতা। অনেক সময় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিষয়াবলি সামাজিক বিষয়াবলির মাঝেও আসতে পারে। কেননা, সংস্কৃতি হলো সামাজিক অবস্থার দর্পণ।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি অর্থ—মানবতাবাদী সুসভ্য আচরণ, নৈতিকতাসমৃদ্ধ শিষ্টাচার এবং উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ; যার ভিত্তি হলো ওহির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। সহজ কথায়—ইসলামি সংস্কৃতি হলো আল্লাহর দেওয়া বিধানমতে জীবনযাপন করা এবং উন্নত সৌজন্যমূলক আচরণ ও নৈতিকতা অবলম্বন করা।

ইসলামি সংস্কৃতির মূলভিত্তি তাওহিদ। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাসই ইসলামি সংস্কৃতির প্রাণ। ইসলামি বিধিবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনও ইসলামি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা ইসলামের পবিত্র জীবনবোধে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়।

অপরদিকে অসুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ব্যক্তিকে বলাহীন ও অশালীন জীবনযাপনে উৎসাহিত করে, যা সমাজ ও জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ক্ষতির প্রভাব এমনই সুদূরপ্রসারী, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে বস্তু ও ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। অবশেষে সে আল্লাহদ্রোহী হয়ে ইহকালে লাঞ্ছনার শিকার হয় এবং পরকালে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয় জাহান্নামে।<sup>১৪</sup>

<sup>১৪</sup> সূরা নূর : ১৯; বাকারা : ৮৫

## আধুনিকতার নামে জাহেলিয়াত

সাম্প্রতিককালের কোনো কিছু—যা ইতঃপূর্বে ছিল না, তা-ই আধুনিক। বর্তমান আবহকে গ্রহণ, অনুসরণ, অনুকরণ ও চর্চাকে বলা হয় আধুনিকতা। এটা হতে পারে বিশ্বাস, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস, পদ্ধতি, আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে। আধুনিকতাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—

ক. যে আধুনিকতা দ্বীন বা আকিদা-ইবাদতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন :

- শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন। প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ তৈরি।
- শিক্ষা শেষে সনদ প্রদান।
- শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদবিন্যাস।
- বিশেষ কোনো ফুল, ফল, পোশাককে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করা।
- শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস প্রকাশ ও বিকাশের স্বার্থে শালীন শিক্ষণীয় নাটক, নাট্যমঞ্চ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ডিবেট ইত্যাদির আয়োজন করা।
- সহজ কথায়—যা অশ্লীল নয়, যা দ্বীন-শরিয়াহর কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তা করতে কোনো অসুবিধা নেই।

খ. যে আধুনিকতা দ্বীন ও আকিদা-ইবাদতের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন :

- নিষিদ্ধ কথা, কর্ম, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি।
- অশ্লীলতা, বেহায়াপনায়ুক্ত এবং নৈতিকতা বিবর্জিত যাবতীয় কাজ।
- মেয়েদের সাজসজ্জা ছেলেদের গ্রহণ করা। যেমন : কানে দুল, হাতে ব্রেসলেট, চুড়ি ইত্যাদি পরা। মাথায় বেগি বা খোঁপা করা, গলায় তাবিজ, লকেট ঝোলানো, নাভির নিচে কাপড় পরা, টাখনুর নিচে কাপড় পরা, চুলের উদ্ভট কাটিং দেওয়া, ট্যাটু লাগানো ইত্যাদি।
- একইভাবে ছেলেদের সাজসজ্জা মেয়েদের গ্রহণ করা। মাথায় পরচুলা লাগানো (এটি প্রতারণাও বটে), চুল ছোটো ছোটো করা, গায়ের মাহরামের সামনে পাতলা জালের মতো কাপড়, গেঞ্জি, প্যান্ট-শার্ট পরিধান করা, টাখনুর ওপর কাপড় পরা, ওড়না বুকে না দিয়ে গলায় ঝোলানো ইত্যাদি।

পুরুষের বেশধারী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষকে রাসূল ﷺ লানত করেছেন। এমনকী তিনি এমন বেশভূষা ধারণকারীদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে বলেছেন।<sup>১৫</sup>

নিজের ইজ্জত-সম্মানের খেয়ানত করে আধুনিকতা প্রকাশের কোনো যৌক্তিকতা নেই। লজ্জাস্থান, গোপনীয়তা প্রকাশই যদি আধুনিকতা হয়, তবে তো বনের পশুরাই সবচেয়ে বড়ো আধুনিক; এগুলো স্পষ্ট জাহেলিয়াত।

## প্রযুক্তির ব্যবহারে জাহেলিয়াত

মহান আল্লাহ বলেন—

‘তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।’ সূরা বাকারা : ২৯

মানুষের প্রয়োজনেই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। যত প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে, এর পেছনে প্রথম উদ্দেশ্য—জীবনকে সহজভাবে উপভোগ করা। এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণেই পৃথিবী এখন বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির কারণে মানুষ সময়কে জয় করেছে, আর অতিক্রম করেছে দূরত্বকে। প্রযুক্তির এই কল্যাণ সমস্ত মানুষকে দিয়েছে অনাবিল আরাম-আয়েশ। পাশাপাশি এটা অন্যায় ও অশ্লীল কাজের দ্বারও খুলে দিয়েছে সবার জন্য। এহেন কোনো ভালো প্রযুক্তি নেই, যা ইসলামের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু আমরা সেটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছি। এর দায় মানুষের, প্রযুক্তির নয়।

প্রযুক্তি আশীর্বাদ না অভিশাপ—এ নিয়ে তর্ক হতে পারে; হতে পারে বিতর্কও। তবে প্রযুক্তিকে আপনি কী কাজে ব্যবহার করছেন, সেটাই মুখ্য বিষয়। ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। প্রযুক্তি যেমন দুনিয়ার কাজকে সহজ করেছে, তেমনই সহজ করেছে দ্বীনের কাজকেও।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আকল শব্দটি ৪৯ বার, ফিকর শব্দটি ১৮ বার ব্যবহার করেছেন। এই আকল (জ্ঞান-বুদ্ধি) বা ফিকির (চিন্তাশক্তি) আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। এই নিয়ামতকেই মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভাবনে ব্যবহার করেছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওষুধই এখন অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রযুক্তির ক্রমাগত অপব্যবহারে জাহেলিয়াতের পথে আমরা প্রবল বেগে ধাবিত হচ্ছি। অবস্থা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে; অচিরেই হয়তো আমরা এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব, যেখান থেকে উত্তরণ প্রায় অসম্ভব। প্রযুক্তির অপব্যবহার বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মাঝে মহামারি আকার ধারণ করেছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে জাহেলিয়াত বিকশিত হয়েছে। যে সমস্ত উপকরণের অপব্যবহার মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে ধাবিত করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

**মোবাইল ফোন :** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মানুষ দূরত্বকে জয় করেছে ঠিকই, কিন্তু এর কারণে ক্রমাগতভাবে হারাচ্ছে নৈতিক মূলবোধ। মোবাইলের সুবিধাকে ব্যবহার করে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেওয়া, ব্ল্যাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেন সাধারণ বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। পাপাচারের অন্যতম হাতিয়ার এখন মোবাইল ফোন। এর পেছনে মানুষ তার মূল্যবান সময় হেলাফেলায় কাটিয়ে দিচ্ছে। নিজের প্রোডাক্টিভিটি ধ্বংস করছে। বাচ্চারা এর পেছনে পড়ে নিজের

সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর কারণে গোপন পাপ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ আমরা ভুলেই গিয়েছি—পাপ যত সংগোপনেই করি না কেন, আল্লাহ তা দেখছেন। দুনিয়াতে এই মোবাইলের ভার বহন করা সহজ হলেও আখিরাতে কিন্তু তা সহজ হবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে।’ সূরা কাফ : ১৮

**ফেসবুক :** সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর অন্যতম ফেসবুক। এতে উপকারের পাশাপাশি অপকারও বিদ্যমান। সাম্প্রতিক আমাদের যুব সম্প্রদায় এর অপব্যবহারকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। সামাজিক যোগাযোগের চেয়ে নারী-পুরুষের অবৈধ যোগাযোগ, অর্ধনগ্ন ছবি, ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এটি—যা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে।

অশ্লীলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

‘যারা পছন্দ করে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক, তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে দুনিয়া-আখিরাতে। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।’ সূরা নুর : ১৯

এজন্য আমাদের ফেসবুক ব্যবহারে অনেক বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আর এমন কোনো পোস্ট কিংবা লিংক শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা জরুরি, যা মৃত্যুর পরও গুনাহে জারিয়াহরূপে বিদ্যমান থাকে।

## চতুর্থ অধ্যায় অর্থনৈতিক জাহেলিয়াত

আমাদের সমাজে প্রচলিত জাহেলিয়াতসমূহের বিরাট একটি অংশজুড়ে রয়েছে অর্থনৈতিক জাহেলিয়াত। আর্থিক লেনদেন ও ব্যবস্থাপনায় সমাজ আজ জাহেলিয়াতে সিক্ত। অসংখ্য জাহেলিয়াতের মধ্যে প্রধান কিছু জাহেলিয়াত নিয়ে আমরা এখানে আলাচনার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ!

- সুদব্যবস্থা
- পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা
- জাকাতসংক্রান্ত জাহেলিয়াত
- শ্রমের মূল্য আদায় না করা
- ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা
- জবরদখল, জমি দখল
- জনগণের অর্থ আত্মসাৎ
- ঘুস আদান-প্রদান

### সুদব্যবস্থা

জাহেলিয়াতের যে সমস্ত অস্ত্র ইসলামি অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলেছে, তার অন্যতম হলো— সুদব্যবস্থা। বর্তমান সমাজে ইসলামি ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ক্ষীয়মাণ। জাহেলিয়াতের দাবানল চারদিকে দাউদাউ করে জ্বলছে। সুদভিত্তিক পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক অর্থব্যবস্থা চারদিকে ছেয়ে গেছে। মুসলিম সমাজ মজে গেছে বিজাতীয়দের অনুসরণ ও অনুকরণে। বিজাতীয় তত্ত্ব-নীতির ভালোবাসায় আমরা প্রলুব্ধ। এ ব্যবস্থা আমাদের ধ্বংস নামক খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

আমরা কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ভুলে যাচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি সেই বিধানকে, যা আইয়ামে জাহেলিয়াতকে পরিবর্তন করে আদর্শ সমাজে পরিণত করেছিল। সেই বিধান যে আজও আমাদের পরিবর্তন করতে পারে—এই বিশ্বাস আমাদের মন থেকে দিনদিন উঠে যাচ্ছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির সর্বোত্তম সোপান—ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলামি অর্থনীতি বলতে আমরা জাকাত, কর্জে হাসানা, তাওয়াল্লিয়া বা ক্রয়মূল্যে বিক্রয়, মুরাবাহা বা লাভে বিক্রয়, মুশারাকা বা অংশীদারত্ব ব্যাবসা, মুদারাবা বা একের মূলধন অন্যের শ্রম, মুসাওয়ামাহ বা মূল্য উল্লেখপূর্বক নগদে ক্রয়-বিক্রয়, বায়ে সালাম বা মূল্য ও সময় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়, মুবাদালাহ-মুকায়াজাহ বা পণ্যের বিনিময়প্রথা বা একচেঞ্জ, মুজায়াদাহ বা নিলামে বিক্রয়, হেবা, ওয়াকফ ইত্যাদিকে বোঝাচ্ছি।



এগুলোর অধিকাংশই সমাজে এখন সঠিকভাবে চলমান নেই; বরং বিকৃতভাবে প্রচলিত। কোনো কোনোগুলো তো একেবারেই হারিয়ে গেছে। ফলে মানুষ এগুলোর উপকারিতা পাচ্ছে না। আষ্টেপৃষ্ঠে পুঁজিবাদ ও ভোগবাদী অর্থব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়েছে।

পুঁজিবাদের প্রধান অস্ত্র—সুদ। এই সুদ মানুষের ঘরে কোনো না কোনোভাবে ঢুকছেই। ক্ষুদ্রঋণ, ব্যাংক ঋণ, মুনাফা, লভ্যাংশ ইত্যাদির নামে ঢুকে পড়েছে ঘরে ঘরে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষার লালসা দিয়ে তা ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে ছাড়াচ্ছে। অথচ ইসলামে এই সুদ সরাসরি হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا-

‘আর আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।’ সূরা বাকারা : ২৭৫

সুদের আরবি প্রতিশব্দ (رِبَا) ‘রিবা’। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রিবাসংক্রান্ত ১২টি আয়াত নাজিল করে তা নিষিদ্ধ করেছেন। সূরা বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮১ পর্যন্ত সাতটি, আলে ইমরানের ১৩০ থেকে ১৩১ পর্যন্ত দুটি, সূরা নিসার ১৬০ থেকে ১৬১ এবং সূরা রুমের ৩৯ নম্বর আয়াত, এই মোট ১২টি আয়াতে রিবা শব্দটি আটবার উল্লেখিত হয়েছে।

সুদ হারাম। এটি জানার সাথে সাথেই মুমিন ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে। এমনকী সুদের সব বকেয়ার দাবিও ছেড়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো; যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।’ সূরা বাকারা : ২৭৮

তবে এটা এখন সুস্পষ্ট—মুসলিম মাত্রই জানে, সুদ হারাম। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকেই সুদ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেউ ইতোমধ্যে সুদি কারবারিতে জড়িত থাকলে তওবা করে সমস্ত সুদের পাওনা মওকুফ করে দিতে হবে। তাহলে আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।’ সূরা আলে ইমরান : ১৩০

মানুষ কৌশলে সুদ খায় : সাধারণত সুদখোররা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সুদকে হালাল বানানোর চেষ্টা করে। তারা বিভিন্ন নামে-বেনামে সুদি কারবার পরিচালনা করে। তাদের এই মনোভাব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তারা বলে—ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই; অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।’ সূরা বাকারা : ২৭৫

রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ-ই সুদমুক্ত থাকবে না। কেউ সুদ না খেলেও এর ধোঁয়া তাকে স্পর্শ করবে।’ ইবনে ইশার বর্ণনায় রয়েছে—‘সুদের ধুলো-ময়লা তাকে স্পর্শ করবে।’<sup>১৬</sup>

অর্থাৎ, সুদের সয়লাব খুব বেশি হবে এবং মানুষ কৌশলে এর কারবার করবে। প্রত্যেকে নামে-বেনামে নিজের অজান্তেই সুদের সাথে জড়িয়ে যাবে। বর্তমানে হচ্ছেও তা-ই। বর্তমানে এ সুদকে বলা হয় মুনাফা, ইন্টারেস্ট, লাভ, ইনসেন্টিভ ইত্যাদি। সমাজের প্রায় প্রতিটি মানুষই লোন, কিস্তি, ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি লোন, শিক্ষা লোন, পেশাজীবী লোন, শিক্ষক লোন, ব্যবসায় লোন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সুদের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ ইচ্ছে করলেও সহজে এসব থেকে বের হতে পারছে না।

**সুদ সম্পদ বাড়ায় না; বরং কমায় :** অনেকে সুদকে লাভজনক মনে করে; অথচ এটি অর্থনীতিকে একপেশে বানিয়ে ধ্বংস করে দেয়। কমিয়ে দেয় উৎপাদনক্ষমতাও। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।’ সূরা বাকারা : ২৭৬

‘যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, তা মানুষের সম্পদের সাথে মিশে বেড়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে জাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, সেটাই মূলত সম্পদ বৃদ্ধিকারী।’ সূরা রুম : ৩৯

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাস পাবেই।’<sup>১৭</sup>

**সুদ জঘন্য অপরাধ :** সুদ অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো—নিজের মায়ের সাথে যিনা করা।’<sup>১৮</sup>

‘রাসূল ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য ও যিনাকারীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি অঙ্কনকারী ও যে করায় এবং ছবি নির্মাণ করে তাকে অভিশাপ করেছেন।’<sup>১৯</sup>

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন—

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের হিসাবরক্ষক এবং দলিল লেখকের ওপর।’<sup>২০</sup>

<sup>১৬</sup> ইবনে মাজাহ : ২২৭৮; মিশকাত : ২৮১৮; আবু দাউদ : ৩৩৩১

<sup>১৭</sup> ইবনে মাজাহ : ২২৭৯

<sup>১৮</sup> ইবনে মাজাহ : ২২৭৮

<sup>১৯</sup> বুখারি : ৫৯৬২

<sup>২০</sup> ইবনে মাজাহ : ২২৭৭

**সুদখোরের শাস্তি :** সুদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন, অন্য কোনো অপরাধের ব্যাপারে তত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেননি। সুদব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

‘অতঃপর যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না। তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না।’ সূরা বাকারা : ২৭৯

‘যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান স্পর্শ (আসর) করে মোহাবিষ্ট করেছে। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো—তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই; অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।

অতঃপর যার কাছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে সুদ থেকে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তারই। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোজখে যাবে। তারাই চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে।’ সূরা বাকারা : ২৭৫

### পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অপর নাম—শোষণ ও পার্থক্য। কে কাকে কত নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করতে পারে, এটাই পুঁজিবাদের মূল স্লোগান। যে করেই হোক অর্থ নিজের থলেতে ভরতে হবে—এটাই পুঁজিবাদের মূল কথা। অর্থ কুক্ষিগত করা, এর যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা এবং অর্থের যথাযথ হক আদায় না করাই হলো পুঁজিবাদের প্রধান ধর্ম।

সম্পদ কুক্ষিগত না করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—

‘তোমরা সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করবে, যেন তা সমাজের বিত্তবানদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত না হয়।’ সূরা হাশর : ৭

‘এবং তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে আছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।’ সূরা জারিয়াত : ১৯

‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেগুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিয়ো না।’ সূরা বাকারা : ১৮৮

পুঁজিবাদের অনিবার্য ফলাফল হলো—ধনী আরও ধনী হবে আর গরিব হবে আরও গরিব। ফলে সমাজে শ্রেণি-বৈষম্য বাড়বে, বৃদ্ধি পাবে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ, চেপে বসবে দরিদ্রতা। এর বিপরীতে ইসলাম দিয়েছে সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা, ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস ও দরিদ্র্য দূরীকরণে জাকাতের মতো সুন্দর সমাধান, সাদাকার মতো মহৎ রীতি এবং কর্জে হাসানার মতো হেল্পিং হ্যান্ড।

## দশম অধ্যায় নামের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি

নিঃসন্দেহে নাম মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নাম ব্যক্তির পরিচয় ও অভিরূচি প্রকাশ করে। একই সঙ্গে এটি ব্যক্তির শোভাও বটে। নাম দিয়েই ব্যক্তিকে দুনিয়া-আখিরাতে সম্বোধন করা হবে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে নামের নানা রকম প্রভাব রয়েছে। নাম অনেকটা পোশাকের মতোই; খাটো হলেও খারাপ দেখায়, আবার লম্বা হলেও খারাপ দেখায়।

নাম রাখার ব্যাপারে শরিয়াহর মূলনীতি হলো—অবৈধ নয়, এমন যেকোনো নাম রাখা জায়েজ। তবে উত্তম বিবেচনার দিক থেকে এর পাঁচটি স্তর রয়েছে। যেমন :

**প্রথম স্তর :** ‘আবদুল্লাহ’ ও ‘আবদুর রহমান।’ এ নাম দুটি সর্বোত্তম। রাসূল ﷺ বলেছেন—  
‘আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে—আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।’<sup>২১</sup>

**দ্বিতীয় স্তর :** আল্লাহর সাথে ‘আবদ’ বা দাসত্বের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া নাম। যেমন : আবদুল আজিজ (আল আজিজের দাস), আবদুর রহিম (আর-রহিমের দাস), আবদুল মালিক (আল মালিকের দাস), আবদুল ইলাহ (ইলাহের দাস), আবদুস সালাম (আস-সালামের দাস) ইত্যাদি।

**তৃতীয় স্তর :** নবি ও রাসূলগণের নামসমূহ। নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মর্যাদাবান হচ্ছেন আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁর আরেকটি নাম আহমাদ।<sup>২২</sup> এর পরের স্তরে রয়েছেন—‘উলুল আজম’ শ্রেণির রাসূলগণ। তাঁরা হচ্ছেন—ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) ও নূহ (আ.)। তাঁদের পরে অন্য সকল নবি ও রাসূল। নবিগণের মর্যাদার বিন্যাস অনুযায়ী তাঁদের নামসমূহেরও মর্যাদার বিন্যাস হবে।

**চতুর্থ স্তর :** আল্লাহর নেককার বান্দাগণের নাম। এই স্তরে প্রথমে আসবে সাহাবিদের নাম। সাহাবিদের অনুকরণ হিসেবে তাঁদের সুন্দর নামানুসারে নাম রাখা মুস্তাহাব।

**পঞ্চম স্তর :** সুন্দর ও সঠিক অর্থবোধক নাম।<sup>২৩</sup>

<sup>২১</sup> মুসলিম : ১৩৯৮

<sup>২২</sup> সূরা সফ : ৬

<sup>২৩</sup> [www.islamqa.com](http://www.islamqa.com) (প্রশ্ন নং : ৭১৮০)

নাম রাখার সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখা ভালো। যেমন :

ক. এ বিষয়টি অনুধাবন করা, সন্তান এ নামটি আজীবন ধারণ করবে। এ নামের কারণে হয়তো তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতি ও সমস্যারও মুখোমুখি হতে হবে। এতে পিতা-মাতার প্রতি তার খারাপ মনোভাব তৈরি হবে।

খ. নামটি উপযুক্ত কি না, তা বিবেচনা করা। এ নামটি একজন শিশুর নাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের নাম, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ও পিতার নাম হিসেবে কেমন হবে? এ নাম দিয়ে উপনাম তৈরি করলে (অমুকের পিতা) কেমন হবে? পিতার নামের সাথে মিলিয়ে লিখলে (অমুক ইবনে অমুক) কেমন হবে? ইত্যাদি।

গ. সন্তানের নাম রাখা পিতার শরয়ি অধিকার। কারণ, পিতার দিকেই সন্তানকে সম্বন্ধিত করা হয়। তবে পিতার জন্য মুস্তাহাব হলো—নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাকেও অংশীদার করা এবং মায়ের মতামত নেওয়া, যাতে নামের ব্যাপারে মা-ও সন্তুষ্ট থাকেন।

ঘ. সন্তানকে পিতার দিকেই সম্বন্ধিত করা ওয়াজিব; যদিও পিতার মৃত্যু হয় কিংবা পিতার সাথে মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এমনকী পিতা যদি সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব না নেয় কিংবা আদৌ তাকে না দেখে, তবুও। সন্তানকে পিতা ছাড়া অন্য কারও সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়া হারাম; শুধু এক অবস্থা ছাড়া। সেটা হলো—যদি ব্যভিচারের কারণে সন্তানের জন্ম হয়, সেক্ষেত্রে সন্তানকে মায়ের দিকে সম্বন্ধিত করা হবে। পিতার দিকে সম্বন্ধিত করা জায়েজ হবে না।

কিছু কিছু নামের ব্যাপারে শরয়ি নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেগুলো পরিহার করা কর্তব্য। এই ধরনের নাম রাখা সরাসরি হারাম। যেমন :

ক. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাথে আবদ বা দাসের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে নাম রাখা; সেটা কোনো নবির সাথে সম্পর্কিত হোক কিংবা ফেরেশতার সাথে। কোনো অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাথে আবদ বা দাস শব্দযোগে নাম রাখা জায়েজ নয়। গাইরুল্লাহর শুরুতে আবদ বা দাসযোগে কিছু নাম হলো—

- আবদুন নবি বা নবির দাস
- আবদুল আমির বা আমিরের দাস
- আবদুল আলি বা আলির বান্দা
- আবদুল কাসেম বা কাসেমের বান্দা
- গোলাম নবি বা নবির গোলাম
- গোলাম হোসেন বা হোসেনের গোলাম ইত্যাদি

এই ধরনের কোনো নাম রাখলে তা পরিবর্তন করা ওয়াজিব। মর্যাদাবান সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন—

‘আমার নাম ছিল عبد عمرو—আবদে আমর বা আমরের দাস। (অন্য বর্ণনায় এসেছে عبد الكعبة বা কাবার দাস।) আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন রাসূল ﷺ আমার নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রাখলেন।’<sup>২৪</sup>

খ. আল্লাহর কোনো বিশেষ নামে নাম রাখা। যেমন : কারও নাম খালেক, রাজেক, রাজ্জাক, রব বা রহমান ইত্যাদি রাখা কিংবা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম রাখা, যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হতে পারে না। যেমন : মালিকুল মুলক বা রাজাধিরাজ, কাহহার বা পরাভূতকারী ইত্যাদি। এ ধরনের নাম রাখা হারাম। কারও এ ধরনের নাম থাকলে তা পরিবর্তন করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন—

‘আপনি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন?’ সূরা মারইয়াম : ৬৫

গ. যেসব নাম বিধর্মী বা কাফির সম্প্রদায়ের বিশেষ নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেসব নাম রাখা হারাম। কারণ, এগুলো বিশেষ একটি ধর্মের পরিচয় বহন করে। যেমন : আবদুল মসিহ বা মসিহর দাস, বুতরাস বা পিটার, জুরজাস বা জর্জ, কৃষ্ণ, ভট্টাচার্য, শ্রী, কার্তিক, নারায়ণ, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

ঘ. যেসব প্রতিমা বা দেবতার নামে পূজা করা হয়, তাদের নামে নাম রাখা। যেমন : মহাদেব, রামায়ণ, গণেশ, ইলিয়ানা, রবি ইত্যাদি।

এ ছাড়াও কিছু কিছু নামের ব্যাপারে শরিয়াহর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় সেগুলো পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন :

ক. সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অপছন্দনীয় নাম রাখা মাকরুহ। কারণ, এই সব নামের কারণে ব্যক্তিকে পরবর্তী সময়ে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের শিকার হতে হয়। তা ছাড়া রাসূল ﷺ ভালো নাম রাখার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাও এর মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়। এই ধরনের কিছু নাম হলো—‘হারব’ (যুদ্ধ), ‘রাশশাশ’ (মেশিনগান), ‘হায়াম’ (উটের বিশেষ রোগ) ইত্যাদি। এসব নামের অর্থ অসুন্দর ও ঘৃণিত।

খ. জৈবিক চাহিদা বা যৌন উত্তেজনার অর্থ বহন করে, এমন নাম রাখা মাকরুহ। মেয়েদের নাম রাখার ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে থাকে। যেমন : কামিনী, রাগিনী, স্পর্শী, মোহিনী, লিলাবতী ইত্যাদি।